International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 78-88
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.271

বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন : দুই রক্তমাখা সবুজ প্রতিরোধ

মহেন্দ্র নাথ পাল

গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 05.04.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

When the British regime's anarchy and exploitation of farmers in the Indian subcontinent reached an intolerable level, the farming community rose up in resistance with every ounce of their strength. Both in the pre- and post-independence eras, the majority of movements and acts of resistance in India were, in essence, manifestations of peasant uprisings. On the threshold of the twenty-first century, two such blood-stained 'green' resistances unfolded in the heart of Bengal: The Singur (2006) and Nandigram (2007) agrarian movements. In these events, the farming community – the very creators of the 'green' – was left bloodied beneath the bulldozers of the rulers' power and arrogance. When the then CPI(M)-led Left Front government of West Bengal sought to seize the fertile, gold-yielding lands of Singur and Nandigram – under the pretext of industrialization – by handing them over to capitalist industrial conglomerates, the local people stepped forward to defend their land – their very 'Mother' – to their last drop of blood. It was then that the wrathful gaze of the Leftist rulers descended upon the peasant masses of Singur and Nandigram. Much like the dark days of the Partition, Singur and Nandigram became a crucible of murder, looting, rape, massacre, and arson. In that hour of crisis, the then Leader of the Opposition, Mamata Banerjee, and her party, the Trinamool Congress, rushed to the aid of this helpless and dispossessed farming community, risking their own lives in the process. With intense vigor and resolve, she emerged as a powerful voice of resistance on behalf of the helpless people of Singur and Nandigram as they faced a looming, tragic fate. Under her leadership, the local farming community found the strength to protest and resist. In those days, the educated class and the intellectual community alike spat in contempt at the brutal, barbaric carnage and anarchy that unfolded around the government's land acquisition drive. The pens of Bengal's poets and fiction writers, too, roared with intense protest and indignation. Through their poetry, short stories, and novels, literary figures such as Mridul Dasgupta, Joy Goswami, Shankha Ghosh, Nirmal Brahmachari, Mamata Banerjee, Mahasweta Devi, Suchitra Bhattacharya, Anita Agnihotri, and Samaresh Majumdar captured the stark reality of the volatile situation in Singur and Nandigram. There, confronted by resistance and protest from all strata of society, the barrel of the ruling power's gun faltered slightly and was compelled to retreat. Serving as faithful chronicles of the bloody history of Singur and Nandigram – a turbulent epoch of strife – and as enduring testimonies to the rulers' compromised humanity, these literary works remain rich in artistic appeal to this day. Within the blood-stained annals of Singur and Nandigram, this struggle waged by the farming community for the sake of their land will forever stand as a pair of resolute, vibrant acts of resistance.

Keywords: Singur and Nandigram, A Bloody Chronicle, Rulers' Arrogance and Menace, Rape and Massacre, Capitalist Industrial Conglomerates, Land Acquisition, Emotional Bond with the Land, Mamata Banerjee, Organized Resistance, Intellectuals' Protest.

সাহিত্য যেমন মানুষের জীবনচর্যা, তেমনি সাহিত্য অস্থির সময়ের দর্পণও বটে। সাহিত্যে বারবারই উঠে আসে দেশ-কালের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সূচীমুখ। আমাদের বাংলা সাহিত্য সেই প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে এই উত্তরাধুনিক পর্বে উত্তরণ পর্যন্ত বহুবিধ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে ধারণ করেই গড়ে উঠেছে। ভারত যেহেতু কৃষিনির্ভর দেশ; তাই কৃষকদের ওপর প্রশাসনের আঘাত বারবার কৃষকগোষ্ঠীকে শামিল করেছে আন্দোলন থেকে গণবিপ্লবে। ১৯৪৬-এর তেভাগা আন্দোলন ও ১৯৬০-৭০ এর দশকের নকশাল আন্দোলন ছিল মূলত তেমনই দুই কৃষক আন্দোলন। ভারতবর্ষ যেহেতু কৃষিজীবী দেশ, তাই ভারতের বেশিরভাগ আন্দোলন প্রতিরোধ বিপ্লবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা বিরাট অংশের কৃষক সমাজের স্বার্থ। তাই স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয়ক্ষেত্রেই বেশিরভাগ রাজনৈতিক গণ আন্দোলনই পক্ষান্তরে কৃষি আন্দোলন। কারণ কৃষক জনতার বহুবিধ ক্ষোভ, চাওয়া না-চাওয়া, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, বঞ্চনার হিসেব– এ সবকিছুই দানা বেঁধে রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে ও স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের এইসব কৃষক আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে ব্যাপকতর ছাপ রেখে গেছে। আর এই বাংলার মাটিতে একুশ শতাব্দীর গোড়ায় ঘটে যাওয়া দুই গণ বিদ্রোহের নাম সিঙ্গুর (২০০৬) ও নন্দীগ্রাম (২০০৭) কৃষি আন্দোলন।

ইতিহাসের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ২০০৬ সালে তৎকালীন সি.পি.আই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার হুগলী জেলার সিঙ্গুরের বহু ফসলী উর্বর সমৃদ্ধ চাষযোগ্য কৃষিজমি জোর করে কেড়ে নিতে চায় শিল্পের অজুহাতে। টাটা মোটরস কোম্পানির কৃষকদের হাত থেকে এই উর্বর বহু ফসলী আবাদযোগ্য জমি কারখানা নির্মাণের নামে কেড়ে নিতে চাওয়া আসলে; কৃষকদের জীবনের একবুক দীর্ঘশ্বাসের মতো। যে জমি তাদের কাছে সোনার মতো, মায়ের মতো মূল্যবান। তার বিনিময়ে বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দিতে চাইলে সিঙ্গুরের কৃষিজীবী পরিবারগুলি তা নিতে অস্বীকার ক'রে একজোট হয়ে রুখে দাঁড়ান। কারণ এই জমি, এই মাটি তাঁদের কাছে মায়ের সমান। যা দীর্ঘদিন তাঁদের মুখে অন্ন তুলে দিয়েছে। কিন্তু সিঙ্গুরের কৃষক জনতার সেই আবেগকে বোঝবার বা বুঝতে চেষ্টা করার ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনোটাই তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের ছিল না। আর তখনই বেরিয়ে আসে শাসকের রক্তচক্ষু। শুরু হয় সরকারী, পুলিশি ও রাজনৈতিক নির্যাতন। শারীরিক অকথ্য অত্যাচার, অগ্নিসংযোগ, খুন, হত্যা, ধর্ষণের আঁতুড়ঘর হয়ে ওঠে সেদিনের সিঙ্গুর। ওইসময় ২০০৭ সালে অসহায় ভূমিহারা মানুষগুলির পাশে সেদিন এক নিঃশ্বাসে গিয়ে দাঁড়ান তৃণমূল কংগ্রেসের মানবদরদী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বে সিঙ্গুরে ২০০৮ পর্যন্ত চলল শাসক-শোষকবিরোধী প্রতিরোধ। আবালবৃদ্ধবনিতা সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিরোধকে অবলম্বন করে শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করার সাহস পেল। সামান্য হলেও শাসকের অদম্য ও অনমনীয় মানসিকতা প্রতিরোধের সামনে পিছু হটলো। তবুও শাসকের বন্দুকের নল আর লালচোখ কোনোকিছুই মানলো না! প্রতিরোধের পরোক্ষ জবাবে তথা শাসকের বিনিময়ী প্রতিহিংসায় প্রাণ হারালো এক ১৬ বছরের কিশোরী মেয়ে তাপসী মালিক।

ঠিক এরকমই ঘটনা ঘটে সেদিনের নন্দীগ্রামে। ২০০৭ সালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরের নিকটবর্তী নন্দীগ্রামে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ইন্দোনেশিয়ার সালেম গোষ্ঠীর জন্য ১৪ হাজার একর জমি দখল করতে চাইলে শুরু হয় কৃষক প্রতিরোধ। সেখানেও শুরু হয় খুন-হত্যা-জখম-ধর্ষণ-শিশু ও নারী নির্যাতনের মতো একাধিক মানবতা-বিরোধী ঘটনা। সেদিনের নন্দীগ্রামের সেই অসহায় দরিদ্র মানুষগুলির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস। তৎকালীন পশ্চিমবাংলার বিরোধী দল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'কৃষিজমি রক্ষা কমিটি'। কিন্তু তৎকালীন শাসকের ক্ষমতার

দম্ভ হয়ে উঠল মাত্রাছাড়া। স্থানীয় মানুষ তাদের মা, তাদের মাটিকে রক্ষা করতে তৎপর হয়ে উঠলে ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশের গুলিতে ১৪ জন মানুষ নিহত হন ও আহত হন প্রায় ৭০ জনেরও বেশি। সেদিনের গণহত্যায় শাসকের চেয়ারের প্রতিটি পায়ায় রক্তের ছিটে লেগে রইলো। শিল্পী-সাহিত্যিক-লেখক-বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু ক'রে সকল স্তরের মানুষ শাসকের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামলেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। সেই সময়পর্বের অজস্র কবিতা-গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধে এই রক্তাক্ত ও অগ্নিদগ্ধ সময়ের ইতিহাস উঠে এল। এখানে আমাদের বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের প্রতিফলনের দিকটি চিহ্নিত করা হল।

কবিতা চিরকালই প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের হাতিয়ার। এই প্রবাদ বাক্যকে সত্য করে কবি মৃদুল দাশগুপ্ত (১৯৫৫) লিখলেন তাঁর 'ধানখেত থেকে' (২০০৭) কাব্যগ্রন্থটি। যে কাব্যের একাধিক কবিতায় ছড়িয়ে আছে সেই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের উত্তপ্ত দিনগুলির ছবি। যেখানে অতি সহজেই বেআব্রু হয়ে পড়েছে সেদিনের শাসকের নখদন্ত বিস্তারকারী রক্তপায়ী চেহারাটা। এই 'ধানখেত থেকে' কাব্যগ্রন্থের 'ভূমিকা'য় কবি লিখেছেন –

> "২০০৬ এর হেমন্তের দুপুরে বাজেমেলিয়ার উদ্ভাসিত ধানখেতের দিকে তাকিয়ে উদ্বেগের পরে মনে আসে ক্রোধ। হুগলির এই জমিকে 'ওঁরা' বলেছেন, এক-ফসলি অনাবাদি। ..... হুগলিতে একফসলী জমি নেই। মাতৃহত্যার সমতুল্য অপরাধ করেছে বামফ্রন্ট সরকার।.... এরপরে ঘটে সিঙ্গুরে দমন-পীড়নের ঘটনা। নন্দীগ্রাম গণহত্যা।"[১]

এই কাব্যটির প্রতিটি অণু-পরমাণু জুড়ে আছে সেদিনের শাসকের অত্যাচার ও কৃষকের চোখের জল। তৎকালীন বাংলায় শাসকের স্বার্থ ও একগুঁয়েমির কাছে হারিয়ে যেতে বসছিল মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ। মানুষ পাশবিক আচরণে লিপ্ত হয়ে উঠছিল। শাসক দলের ছত্রছায়ায় দৈনন্দিন জীবন-প্রতিবেশের অনেক চেনা মুখ সেদিন হয়ে উঠছিল অচেনা। শাসকের সেইসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে কবি মৃদুল দাশগুপ্ত তাঁর 'ক্রন্দনরতা জননীর পাশে' কবিতায় লেখেন–

> "নিহত ভাইয়ের শবদেহ দেখে
> না-ই যদি হয় ক্রোধ
> কেন ভালোবাসা, কেন-বা-সমাজ
> কীসের মূল্যবোধ!"[২]

আসলে শিল্পী হিসাবে কবির নৈতিক মূল্যবোধ ও মানবিক আদর্শ সেদিন তাঁকে স্থির থাকতে দেয়নি। বৃহত্তর অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে তাঁর কলম। শাসকদলের রক্তচক্ষুর মুখাপেক্ষী না হয়ে তাঁর প্রতিবাদ আপসের গোপনীয়তায় মাথা ঘুরে মরেনি। বরং তা সপ্রতিভ সত্তায় গর্জে উঠেছে। তৎকালীন সময়ে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক হত্যা, ধর্ষণ, খুনের বিরুদ্ধে তিনি সামাজিক মূল্যবোধকে জাগাতে পারেন। শাসকের দম্ভের বিরুদ্ধে তিনি এভাবে জাগাতে পারেন জনরোষ। এভাবে তিনি তৎকালীন শাসকের মুখে থুতু ছিটিয়ে দিয়েছেন। সিঙ্গুরের জমি আন্দোলনের প্রতিবাদী কিশোরী তাপসী মালিকের ধর্ষিত হওয়ার জোরালো প্রতিবাদও তাঁর কবিতায় বর্ষিত হয়েছে। তাছাড়া এই কাব্যের 'ধানখেত থেকে' নামাঙ্কিত কবিতা, 'বর্গিহানা ২০০৬', 'রাজার ঘোড়া', '১৪৪', 'সিঙ্গুর', 'ডাকাতে কালীমন্দির' ইত্যাদি কবিতায় সেদিনের বহিরাগত 'বর্গী-শোষকে'র আগমন ও কৃষকের লাঠিসোটা নিয়ে প্রতিরোধের কড়চা নির্মাণ করেন কবি মৃদুল দাশগুপ্ত। সেদিনের শিল্প শিল্প খেলায় সিঙ্গুরের চেনা ভূগোল কিভাবে রক্তের হোলিতে অচেনা হয়ে উঠছিল - তারই চিত্ররূপ একাধিক কবিতায় প্রতিরোধের বয়ানে তুলে ধরেছেন কবি মৃদুল দাশগুপ্ত।

হুগলি জেলার পাক্ষিক 'প্রতিপক্ষ' পত্রিকায় ১৬ এপ্রিল ২০০৭ সালে প্রকাশিত 'বর্গিহানা ২০০৬' কবিতায় সেই সোনার মাটি কেড়ে নেওয়া বর্গীদের বিরুদ্ধে কবি মৃদুল দাশগুপ্ত লেখেন –

"ঘোরতর সেই সর্বনাশে
কৃষিজমি যায় নগরের গ্রাসে
আমি বলবই - সেটা অন্যায় ।"[৩]

আসলে শিল্পের নাম করে মাতৃতুল্য কৃষিজমিকে শাসন ক্ষমতার জোরে কৃষকদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার অপচেষ্টা, কৃষকদের জীবনে মর্মান্তিক ভবিতব্যের ইঙ্গিত দেয়। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের সেই বিপর্যস্ত, শঙ্কিত কৃষকদের মর্মবেদনায় সমব্যথী হয়ে কবি এই কবিতা লিখলেন। এই কাব্যের **'রাজার ঘোড়া'** কবিতায় মা-বোনদের ধর্ষণ, কৃষকদের হত্যা, পুলিশের অত্যাচার সবকিছু ছোট ছোট ব্যঞ্জনায় স্পষ্টত রূপ দিলেন কবি -

"হতাহত পড়ে আছে,
কেউ বা বুলেটে বেঁধা
কেউ বা আধপোড়া ।"[৪]

খুন ও ধর্ষণ সেদিন হয়ে উঠেছিল নিত্যনৈমিত্তিক সহজ, স্বাভাবিক ঘটনা। উপরিউক্ত পংক্তিগুলি সেই অগ্নিগর্ভ সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামকেই তুলে ধরে। 'বুলেটে বেঁধা' কথাটি শহীদ রাজকুমার ভুল ও 'আধপোড়া' কথাটি তরুণী শহীদ তাপসী মালিকের অর্ধদগ্ধ দেহটার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। সেদিনের শাসকের চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করেই শিল্পীসমাজ এভাবে প্রতিবাদে নেমেছিল। ২০০৭ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত সংঘটিত নন্দীগ্রামের কৃষকের গণবিপ্লবে ভীতসন্ত্রস্ত বামফ্রন্ট সরকার যেদিন পুলিশি গণহত্যা ঘটালো, সেদিন থেকে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল শিল্পীদের কলম। শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী সমাজের একটি বিরাট অংশ সেদিন পথে নেমেছিল। এতে তো আন্দোলন দমন করা গেলই না। বরং প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ল সর্বস্তরে। 'ইতিহাস' কবিতায় কবি মৃদুল দাশগুপ্ত লেখেন –

"ভেসে আসা শব, পরিচয়হীন
কী তোমার নাম?
---- নন্দীগ্রাম।"[৫]

নীরবে, নিভৃতে দাঁড়িয়ে সেই রক্তবিক্ষত ইতিহাস লিখে নিল সবকিছু। এমনকি তাঁর 'লাল পতাকা' কবিতায় মুখে জনদরদী নীতির কথা বললেও বামফ্রন্ট সরকারের সত্যিকারের ভন্ডামি ও দ্বিচারিতার মুখোশ তিনি খুলে দেন অকপটে। কালের সরণি বেয়ে বয়ে চলা এইসব রাজনৈতিক ইতিকথার মূল্যায়ন করতে বসি আজ আমরা। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। বরং শাসকের সর্বগ্রাসী একাধিপত্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঔদ্ধত্যের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ও নিদর্শন এটি।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের এই ভাঙনপর্বের আরেকজন কবি হলেন জয় গোস্বামী (১৯৫৪)। তাঁর 'শাসকের প্রতি' (২০০৭) কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতায় সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সেই জ্বলন্ত ছবি উঠে এসেছে। কবি যেন আমজনতার প্রতিনিধি হয়ে শাসকের উদ্দেশ্যে অঙ্গুলি উঁচিয়ে তীব্র প্রশ্নবাণে তাকে বিদ্ধ করে এই কাব্যটি লেখেন। বইটি ছড়িয়ে পড়ে জনগণের হাতে হাতে। যার মধ্য দিয়ে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের নৃশংস চেহারাটা আরো বেশি করে বেআব্রু হয়ে পড়ে। এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের 'ভূমিকা'য় কবি জয় গোস্বামী লেখেন -

"দু'হাজার সাত সালের ১৪ মার্চ পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন ও দুষ্কৃতীরা যৌথভাবে হামলা চালায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে। নারীপুরুষ নির্বিশেষে গুলিতে নিহত মানুষের সংখ্যা দাঁড়ায়

১৪ জন! এই ছিল সরকারি হিসেব। ধর্ষিতা হন মহিলারা। আক্রান্তের তালিকায় শিশুরাও বাদ যায় না। এক হিম আতঙ্কের বাতাবরণ আর জমে ওঠা প্রতিবাদের আবহে লিখিত হয় 'শাসকের প্রতি'।"[৬]

এই 'ভূমিকা' অংশের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কবিকথিত এই কটি বাক্যই গোটা সময়ের চালচিত্রটিকে তুলে ধরছে। সেদিনের নন্দীগ্রামে রাতারাতি উধাও হয়ে যাচ্ছিল মানুষের জীবন ও মানুষের লাশ। এই কাব্যের 'শাসকের প্রতি' নাম কবিতায় তিনি লেখেন –

"আপনি যা বলবেন আমি ঠিক
তা-ই করব, তাই খাবো, তা-ই পরবো, তা-ই গায়ে মেখে
বেড়াতে বেরবো
আমার নিজের জমি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবো কথাটি না-ব'লে।"[৭]

আসলে শাসকের অভিপ্রায় ছিল তাই-ই। তারা ভাবছিল তারা যেহেতু শাসক, তাই তাদের একনায়কতন্ত্রী শাসন ক্ষমতায় ভর করে তারা কৃষকের জমি কেড়ে নেবে, আর কৃষকরা তা নির্দ্বিধায় শাসকের হাতে সমর্পণ করে নীরবে অশ্রুমোচন করবে। কৃষকের ওপর সরকারের আরোপিত জবরদখলকারী নীতির প্রতিটি অন্ধকারকে চিনিয়ে দেয় এই পংক্তি কয়টি। যেখানে কৃষকের জমির ওপর তার অধিকার থাকবে কিনা এবং সেই শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার থাকবে কিনা; সেই গণতান্ত্রিক অধিকারটুকু সেদিন কেড়ে নিতে চেয়েছিল সি.পি.আই.(এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার।

কবি জয় গোস্বামীর 'শাসকের প্রতি' কাব্যগ্রন্থের 'শিল্প' কবিতায় শিল্প স্থাপনের নামে শাসকের সীমাহীন মৃত্যুলীলা ও হত্যালীলার আখ্যান এভাবে রূপ পায় –

"আমাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে
তাড়াও, তারপর তৈরি করো
আমাদেরই বুকের উপরে
উঁচু শিল্প, উদ্ধত সমাজ।"[৮]

তিল তিল করে রক্তবিন্দু দিয়ে গড়ে ওঠা কৃষিজমির আবেগ নগরায়িত শিল্প-সভ্যতার কাছে যে কত তুচ্ছ তা কৃষক সমাজের এই প্রতিরোধী আখ্যানেই উঠে আসে। 'ভরত মন্ডলের মা' কবিতায় এক বৃদ্ধা মহিলা হয়ে ওঠেন মা-মাটি-মানুষকে রক্ষা করার প্রতিবাদী মুখ। মাটি যে তাদের মা! সেই মাকে তাঁরা অস্বীকার করবেন কিভাবে! মা যে তাঁদের অন্নদাত্রী, অন্নদা। এতদিন সেই মা তাঁদের বুক দিয়ে অন্ন দিয়েছে। সেই মায়ের বুকে থেকে আজ কেউ ইজ্জত লুঠে নিতে এলে তারা নীরব থাকেনই বা কি করে! সেই মায়ের ইজ্জত নিতে এলে তো এভাবে জোর প্রতিবাদ হবেই–

"বৃদ্ধা বললেন:
'আমার এক ছেলে গেছে, আরেক ছেলেকে নিয়ে যাক
জমি আমি দেব না ওদের।
এই যে হাত দুটো দেখছ বাবা...'
.....
এই হাত দুটো দিয়েই জমি কেড়ে নেওয়া আটকাবো।"[৯]

এই কাব্যের 'তুমি আর তোমার ক্যাডার' কবিতায় দেখি বামফ্রন্ট সরকারের স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের উদ্ধত চেহারাটা আরো বেশি ক'রে প্রকাশিত হয়ে পড়ে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের গণবিপ্লবের দিনে –

"অস্ত্র প্রয়োগের অধিকারী
তুমি আর তোমার ক্যাডার ।"[১০]

সেদিন উত্তপ্ত বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিপালিত হচ্ছিল সি.পি.আই(এমে)র অনুগত গুন্ডাবাহিনী। শাসকের বিরোধিতা করলেই সমস্ত হিসেব ও মাশুল বুঝিয়ে এবং মিটিয়ে দিত যারা। জয় গোস্বামীর 'শাসকের প্রতি' কাব্যেরই 'স্বেচ্ছা', 'শোক', 'লাশ', 'ফাঁসুড়ে বেচারী', 'ক্ষত', 'আইনশৃঙ্খলা', 'বাংলার গা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে' ইত্যাদি কবিতায় সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ভূমি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সরকারের মানুষ মারার নীতি ও অত্যাচারী হিংস্র রূপকে বারবার নগ্ন করে দিয়েছেন কবি নির্ভীকচিত্তে।

প্রখ্যাত কবি শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২১)– এর ২০০৭ সালে ১৮ মার্চ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'সবিনয় নিবেদন' কবিতাটি নন্দীগ্রাম গণহত্যার পরেই প্রকাশিত হয়। সেই মর্মান্তিক গণহত্যার প্রতিবাদেই সেদিন কলম ধরেন কবি। সরকারি হিসাবের বাইরে সেই বাম জমানায় নন্দীগ্রামের বুক থেকে কত মানুষের প্রাণ যে কর্পূরের মতো রাতারাতি উবে গিয়েছিল; তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কবিতাটি 'মাটি খোঁড়া পুরোনো করোটি' (২০০৯) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে কবি শঙ্খ ঘোষ লেখেন –

"যে মরে মরুক অথবা জীবন
কেটে যাক শোক করে -
আমি আজ জয়ী, সবার জীবন
দিয়েছি নরক করে।"[১১]

বামফ্রন্ট শাসক তখন সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামকে নরক বানিয়ে 'শিল্প-শিল্প' খেলায় মেতেছিল। সিংহাসনের দম্ভ তাদের মনুষ্যত্বকে নির্বাসিত করেছিল বহুদূরে। শঙ্খ ঘোষের এই কাব্যের 'বহিরাগত' কবিতাতেও সেই অগ্নিগর্ভ সময় উঠে এসেছে। তাছাড়া কবি শঙ্খ ঘোষের 'শুনি শুধু নীরব চিৎকার' (২০১৫) কাব্যগ্রন্থের অজস্র কবিতাতেও সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের মানুষের কান্না উঠে এসেছে। সেখানকার মা-বোন-ভাইয়ের এক একটি অশ্রু ও রক্তবিন্দু দিয়ে বহু কবিতার অক্ষর রচিত হয়েছে। সেদিনের সিঙ্গুর, সেদিনের নন্দীগ্রাম কবি শঙ্খ ঘোষের শিল্পীমনেও সুস্থ নিদ্রার অবসর দেয়নি। এছাড়া কবি বিশ্বনাথ গরাই এর 'গ্রাম সিঙুরের আমি' (২০০৭) কাব্যগ্রন্থের সিংহভাগ কবিতার কেন্দ্রবিন্দুতেই রয়েছে সিঙ্গুর জমি আন্দোলন। সিঙ্গুরের চেনা ভূগোলের বদলে যাওয়া অস্থির আবহই তাঁর একাধিক কবিতার উপকরণ। তবে সেদিন সমস্ত শিল্পী-সাহিত্যিক-কবিরা এইসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেও সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) তৎকালীন সি.পি.আই.(এম)- এর মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও তার সরকারের পক্ষেই সাফাই দিয়েছিলেন। যার প্রতিবাদে কবি জয় গোস্বামীদের প্রতিরোধ আরো তীব্র ও বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

এই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে সেদিন নিজের মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করেও যে মানুষটি সাহিত্যিক প্রতিবাদ এবং সশরীরে উপস্থিত থেকে প্রতিবাদ-লড়াই-আন্দোলন ও সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন, ইতিহাস গড়েছেন তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুকের রক্ত জল করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলানো শ্রমজীবী কৃষকদের প্রতি গভীর মমত্ববোধে কবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মতলায় সিঙ্গুর আন্দোলনের অনশন মঞ্চে লড়াই ও ধিক্কারে মুখর হয়েছেন বিভিন্ন কবিতার মাধ্যমে। কবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'মা-মাটি-মানুষ' (২০০৭) কাব্যগ্রন্থের 'নন্দী মা', 'নন্দীগ্রামের লড়াই', 'সিঙ্গুর', 'তাপসী', 'নন্দীগ্রাম বাঁচবে তো', 'নন্দীগ্রাম বারুদ', 'মা মাটি মানুষ', 'চেয়ার', 'সম্রাট', 'সিঙ্গুরের কান্না', 'নুরুলের মা', 'কোলের শিশু', 'খেতমজুর', 'সিঙ্গুরের শ্মশান' ইত্যাদি কবিতায় সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে বামফ্রন্ট শাসকের অকথ্য হত্যালীলা ও অত্যাচারের নির্ভেজাল চিত্র তুলে ধরেছেন। বামফ্রন্ট সরকারের সেদিনের জান্তব, বীভৎস চেহারাটা তার মতো করে ব্যবহারিকভাবে মাঠে ময়দানে থেকে এত বেশি

করে কেউ উপলব্ধি করেননি। আসলে তিনি মৃত্যুভয় উপেক্ষা ক'রে সামনে থেকে এই প্রতিরোধ ও লড়াইয়ের সঙ্গে মিশে গেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'মা-মাটি-মানুষ' (২০০৭) কাব্যগ্রন্থের 'ভূমিকা'য় তাই লিখেছেন–

> "মা মাটি মানুষকে নিয়েই আমার জীবনের পথ চলা শুরু। সেই মা-মাটি-মানুষ যদি পদে পদে স্বেচ্ছাচারিতার বুলডোজারে আক্রান্ত হয়, তবে হৃদয়ে জাগে এক বিষম ব্যথা। এই ব্যথার জাগরণেই লেখনী হয় চকিতে জাগ্রত।..... সিঙ্গুর- নন্দীগ্রামকে কেন্দ্র করে এই মা-মাটি-মানুষের কবিতার বই।"[১২]

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিশ্বস্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল তাঁর 'নন্দী-মা' (২০১০) গ্রন্থটি। 'মা মাটি মানুষ' (২০০৭) কাব্যের 'নন্দী মা' কবিতায় কবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে উঠে আসে সেদিনের হাজার হাজার নন্দীগ্রামের মা-বোনেদের ইজ্জতের লড়াই, তাঁদের আর্তনাদ, বাঁচার জন্য আকুতি-

> "আমরা তো মানুষ
> কেন আমাদের বক্ষ ছিঁড়লে?
> কেন আমাদের বস্ত্র টানলে?
> কেন প্রাণ দেবতার জয়টিকা পরে
> ছিড়েছ ইজ্জতের বন্ধন।"[১৩]

মানুষের প্রাণ সেদিন হয়ে পড়েছিল মূল্যহীন। নারীর সম্মান, লজ্জা, ইজ্জত সেদিন ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল হিংস্র নরপশুদের হাতে। রাজনীতি যে মানুষ ও মনুষ্যত্ব বাদ দিয়ে নয় - এই বৃহত্তর সত্যটাই ভুলে যেতে বসেছিল সেদিনের শাসক।

ধর্মতলার অনশন মঞ্চে বসে, সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'তাপসী' কবিতাটি। যাতে শাসকের বর্বরতার চিত্রটি খুব বিশ্বস্ততার সঙ্গে উন্মোচিত। সিঙ্গুরের জমি আন্দোলনকারী ১৬ বছরের কিশোরী তাপসী মালিকের হত্যার প্রতিবাদে তিনি কবিতাটি লেখেন–

> "তোমার মাংসে যাদের নৃত্য
> জানে না তারা পাশবিকতার অভিশাপ।"[১৪]

সেদিন বামফ্রন্ট সরকারের রাজনৈতিক ক্যাডাররা ঘরে ঘরে মা-বোনেদের সাদা থান উপহার দিত এবং এই ঘটনা ঘটতো গ্রাম-বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে। সিঙ্গুর ভূমি আন্দোলনের দিনে হিংস্র জানোয়ারদের সেই উন্মত্ত আস্ফালন আরো তীব্র হয়ে ওঠে। 'সিঙ্গুরের কান্না' কবিতায় সেই দিকটি তুলে ধরেন কবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়–

> "মা-বোনেদের সিঁথির সিঁদুর
> কোন অত্যাচারের রঙে রেঙেছিলে
> রাজতন্ত্রের তাণ্ডব বাহিনীরা!"[১৫]

বলপূর্বক জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ সেদিন উঠে এসেছিল সার্বিকভাবে। সেদিন জমি অধিগ্রহণের নামে শ্মশানে পরিণত করা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের রক্তলীলা স্থির থাকতে দেয়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনদরদী মনকে। প্রতিবাদীর মৃতদেহকেও সেদিন শ্মশানে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। নীতি ও নৈতিকতার কতটা অবক্ষয় ঘটলে শাসকের এমন কঙ্কালসার চেহারাটা সামনে চলে আসে। সবকিছুতেই তাদের হিংস্র আধিপত্যের নখ ও দাঁত বেরিয়ে পড়েছিল। 'সিঙ্গুরের শ্মশান' কবিতায় তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন–

> "আমি জমি দিতে রাজি হইনি
> তাই আমার মৃত্যুর পরেও

আমার মৃতদেহটা গ্রামের শ্মশানে
নিয়ে যেতে দিলে না।
শ্মশানটাকেও দখল করলে।।"[১৬]

সেদিনের শাসকের এই হিংস্র আগ্রাসন ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজের প্রতিটি স্তরে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তাই তাদের প্রতিহিংসার আগ্রাসন থেকে বাদ যায়নি জীবনের অন্তিম মঞ্চ শ্মশানটুকু পর্যন্ত।

তবে শুধুমাত্র কাব্যসাহিত্যে নয়, কথাসাহিত্যের বিস্তৃত পরিসরেও উঠে এসেছে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ভূমি আন্দোলন। কথাসাহিত্যে যেহেতু জীবনের বিচিত্র অভিমুখ দেখানোর পরিসর অনেক বেশি, তাই একাধিক উপন্যাসে সেই রাজনৈতিক সমকাল খুব সূক্ষ্মতার সঙ্গে চিত্রিত। যেমন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬–২০১৬) তাঁর 'তিনকন্যা ও অধবা' (২০০৯) নামক অণু-উপন্যাস দুটিতে তিনি বামফ্রন্ট সরকারের ভ্রান্ত সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নীতিকে চিত্রিত করেন। ভ্রান্ত শিল্পনীতি যখন জনজীবনকে মৃত্যুর কাঠগড়ায় দাঁড় করায়, তখন তা জনকল্যাণের পরিবর্তে দলকল্যাণ ও ব্যক্তিকল্যাণ হয়ে ওঠে। আসলে এটা খুবই সত্য কথা যে, রাজনীতি যখন জনকল্যাণের পথ পরিত্যাগ করে দলকল্যাণ ও ব্যক্তিকল্যাণের অস্ত্র হয়ে ওঠে তখন সমাজের সার্বিক অবক্ষয় অনিবার্য। তখন সমাজ পরিণত হয় নরকে। মহাশ্বেতা দেবী সেই বার্তাই এই উপন্যাসে দিতে চাইলেন। সেদিনের সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম সেই নরকভূমিই গড়ে তুলেছিল। 'তিনকন্যা' হল নন্দরাণি, চন্ননী ও বাসনাবালার মর্মন্তুদ কাহিনী। আর 'অধবা' হল সরস্বতীর বীভৎস কাহিনী, যা সময়ের চালচিত্র ও রাজনৈতিক ভন্ডামির ক্ষতকে চিনিয়ে দেয়। কথাসাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের (১৯৫০–২০১৫) লেখা 'আঁধারবেলা' (২০১০) উপন্যাসটিতে সিঙ্গুর আন্দোলনের কাহিনিই স্থানের নাম বদলে যেন পাঠকের কাছে চাক্ষুষ ধরা দিয়েছে। সেদিনের সিঙ্গুর ইতিকথার অবিকল ভাষ্যরূপই যেন নির্মাণ করেন সুচিত্রা দেবী। উপন্যাসটির কথাবস্তুতে দেখি প্রায় ষাট ছুঁইছুঁই প্রভাসবাবুর শহুরে মধ্যবিত্ত জীবন। বেলেঘাটার এক চারতলা ফ্ল্যাটে তাদের বসবাস। ছেলে অয়ন কলেজের অধ্যাপক এবং পুত্রবধূ আঁখি স্কুলশিক্ষিকা ও নামী নাট্যদলের অভিনেত্রী। তাই মোটামুটি বেশ স্বাচ্ছন্দ্যময় মধ্যবিত্ত জীবন পরিসর তাদের। সেইসময় হঠাৎ এক দামি জাপানি গাড়ি সংস্থার কারখানার জন্য সরকার যতটা জমি অধিগ্রহণ করেছে, তার মধ্যে তাদের গ্রামের রুদ্রপুরের জমিটুকুও পড়েছে। জমির বিনিময়ে সরকারের থেকে ভালোমতো দামও পাবেন প্রভাসবাবুরা। রুদ্রপুরের চাষীরা কিন্তু এই অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে রুখে দাঁড়ালেন। রাজ্যজুড়ে পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্কের ঝড়। প্রভাসবাবু কৌতূহলবশত রুদ্রপুরে গিয়ে ভাগচাষীর আত্মহত্যা, একনিষ্ঠ কৃষক আন্দোলন এসবের মুখোমুখি হলেন। আন্দোলনকারী এক তরুণী শ্যামলী দলুইয়ের মৃতদেহ পাওয়া গেল গাড়ি কারখানার সীমানায়। মর্মাহত প্রভাসবাবু ছিঁড়ে ফেললেন জমির বিনিময়ে সরকারের কাছ থেকে পাওয়া চেক। রুদ্রপুর ও শ্যামলী দলুই আসলে নাম পাল্টে সিঙ্গুর ও তাপসী মালিকের ইতিহাসকেই তুলে ধরে। সেই সাম্প্রতিক সময়কালই সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'আঁধারবেলা' (২০১০) উপন্যাসে মুখর হয়ে উঠেছে। এ আসলে সিঙ্গুরের জমি আন্দোলনের ইতিহাসের সামাজিক ও সাহিত্যিক নিদর্শন। বামফ্রন্ট সরকারের সেই অন্ধকারতম দিক ও সমাজের সেই আঁধারবেলাকে চিহ্নিত করলেন ঔপন্যাসিক সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর এই উপন্যাসে। যেখানে সমকাল শুধু কথা বলে না, ছবি হয়েও ফুটে ওঠে।

এছাড়া কথাকার সমরেশ মজুমদার (১৯৪৪–২০২৩)- এর আত্মপক্ষ (২০০৯) উপন্যাসেও নাম না করে উঠে এসেছে জমি অধিগ্রহণের অত্যাচারী রূপ। যা সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনের দিনগুলির বামফ্রন্ট সরকারের আগ্রাসী রূপটিকেই বাস্তবতা দেয়। সমরেশ মজুমদারের 'অনিমেষ চতুষ্কে'র চতুর্থ উপন্যাস 'মৌষলকাল' (২০১৩) -এ উঠে এসেছে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামের আন্দোলনের কথা। উপন্যাসের কাহিনীতে দেখি, অনিমেষ-পুত্র অর্ক নন্দীগ্রাম আন্দোলনে জড়িয়ে গেছে। প্রতিবাদ মিছিলে হাঁটা, নন্দীগ্রামের বিপ্লবীকে আশ্রয়

দেওয়া- সবটুকুই তার সঙ্গে জুড়ে গেছে। এই উপন্যাসের আধার পশ্চিমবঙ্গের সেই উত্তাল সময়। রাজনৈতিক পালাবদলের বাঁকে উপস্থিত মাঝবয়সী অর্ক। এই উপন্যাসে অর্ক যেন সেই রাজনৈতিক পালাবদল চাওয়া বদলমুখী জনতার মেজাজ ও মনোবীজের প্রতিভূ হয়েই ধরা দিল। সেই মৌষল পর্বের আবর্তই এই উপন্যাসে কেন্দ্রীয় স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্নর রায়ের (১৯৫৩) 'পতনের পর' (২০১২) উপন্যাসেও সেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট চিত্রিত। যা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের দিনের দগদগে ক্ষতচিহ্নগুলিকে চিনিয়ে দেয়। শুধু উপন্যাসই নয়, কথাসাহিত্যের অন্য সংরূপ ছোটগল্পেও এর প্রভাব চিত্রিত। ২০০৭ সালের ২৫ মার্চ 'বর্তমান' পত্রিকায় প্রকাশিত জয়ন্ত দে (১৯৬৪)- এর 'নির্বাণ' গল্পটি যেন নন্দীগ্রাম গণহত্যার সরাসরি সম্প্রচার। নন্দীগ্রামে শহীদ হয়ে যাওয়া সেই মানুষগুলোর চোখের জল ও রক্ত যেন মিশে আছে এই গল্পে। কথাকার অমর মিত্রের (১৯৫১) 'একা এবং কয়েকজন' ('বারোমাস' পত্রিকা, শারদীয় ২০০৭), মধুময় পাল (১৯৫২)– এর 'সেই মেয়েটা জ্বলছে', নলিনী বেরা (১৯৫২)–র 'চুপ, এক মিনিট নীরবতা চলছে', অর্ধেন্দুশেখর গোস্বামী (১৯৫১)-র 'হাইওয়ে' ('ভূমধ্যসাগর', নভেম্বর ২০১৬) ইত্যাদি গল্পে উঠে এসেছে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের জ্বলন্ত বাস্তবচিত্র। এই জমি বিক্রিতে আবার দালালচক্রের সক্রিয়তা উঠে এসেছে উৎপল ঝাঁ-এর 'বিষফোঁড়া' ('আলো' পত্রিকা, পূজা সংখ্যা, ২০০৭) গল্পটিতে। একদল মানুষের চোখের জল ও আবেগকে হাতিয়ার করে সেদিন বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ আপন স্বার্থসিদ্ধি ও নিজ ফায়দা লুঠতেই ব্যস্ত ছিল। শিল্পের নামে চাকরির প্রতারণা বা দেহ ব্যবসার চাকরির কথা উঠে এল দীপঙ্কর দাসের 'চাকরি' ('বর্তমান' পত্রিকা, ৮ এপ্রিল ২০০৭) গল্পে। জমি বিক্রি করে সর্বস্বান্ত হয়ে আত্মহত্যার কাহিনী দেখি পঙ্কজ চক্রবর্তীর 'হারাধন বাগের জন্মভূমি' ('দৈনিক স্টেটসম্যান, ১০ জুন, ২০০৭) গল্পে। আসলে সেদিন কৃষকের কাছে জমি বিক্রি ছিল নিজের মাকে এক অনিশ্চিত ভবিতব্যের মুখে বিসর্জন দেওয়া। অচিন্ত্য সেনের 'ভাগচাষি' ('উবুদশ', মার্চ ২০০৯) গল্পে জমি হারিয়ে নিজের জমিতে ভাগচাষি হওয়ার আত্মসংকট চিত্রিত। জমির সঙ্গে, মাটির সঙ্গে যার দৈনন্দিন আত্মিক সম্পর্ক, সে-ই অনুভব করবে এই অস্তিত্বহীনতার যন্ত্রণা। এইভাবে এইসব গল্পে কৃষক সমাজের সার্বিক বিপর্যয়কে দেখানো হয়েছে।

সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, সংঘবদ্ধ মানুষের সুস্থ জীবন যখন বিঘ্নিত হয়; আন্দোলিত হয় তাদের নিশ্চিত জীবনের নিরাপত্তা, তখনই গড়ে ওঠে প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, বিপ্লব। বাংলায় সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষক আন্দোলনও ছিল তাই। অন্যান্য গণ-আন্দোলনের মতো এটিও একটি বিরাট চেহারা নেয়। বামফ্রন্ট সরকারের দমনপীড়ন নীতি, শাসকের রক্তচক্ষু এই প্রতিরোধকে দমাতে পারেনি। বরং তা আরো প্রখর তীব্রতায় জ্বলে উঠেছে। হাজার হাজার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ ডানা মেলেছে। কিন্তু শাসক তার পাশবিক হিংস্রতা, নখ-দন্ত বিস্তারকারী রূপ দেখাতে ভোলেনি বিন্দুমাত্র। সেদিনের শহুরে নাগরিক সমাজ, শিল্পী-সাহিত্যিক-লেখকগোষ্ঠীসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের এই গণচেতনা সাহিত্যের বহুমুখী শাখায় যে ছাপ ফেলল, তা কেবল আন্দোলন ও লড়াইয়ের ইস্তেহার হয়েই আবদ্ধ থাকেনি। তা বাংলা সাহিত্যের জমিটিকেও যথেষ্ট উর্বর করেছে। এই প্রতিরোধ শাসকের অধিগ্রহণ ও ক্ষমতাতন্ত্রের ভিত যেমন নাড়িয়ে দিয়েছিল, ঠিক তেমনি এটি বিক্ষত উত্তাল সময়পর্বের এক দগ্ধ চিত্ররূপ হয়ে থেকে গেল পরবর্তী দশকগুলোর কাছে। পরবর্তী ঐতিহাসিকরা যখন জীবাশ্মের ঢাকনা খুলে ইতিহাস লিখতে বসবেন তখন এই সমস্ত কবিতা-গল্প-উপন্যাসগুলিও হয়ে উঠবে ইতিহাসের বিশ্বস্ত সাহিত্যিক উপাদান। আর এখানেই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা সাহিত্যগুলির সোনালী উত্তরণ। যে উত্তরণ কেবলমাত্র ইতিহাসের ঘটে যাওয়া রক্ত ও মৃত্যুর নেতিবাচকতা দিয়েই শেষ হয়ে যায় না। সেখানে থাকে প্রতিরোধী কণ্ঠে বাঁচার এক মৌল ব্রত। সেখানে থাকে শুধুই জীবন, জীবনের অধিকার ও অঙ্গীকার। অন্ধকারের হিমকুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে নতুন গর্ভমোচিত আলো। পৃথিবীর যেকোনো দেশ-কাল-

সমাজের কৃষকের কাছে তাই ঘনীভূত আঁধারের পরে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম এমনই দুই আলোর নাম। যে আলোয় হীরকস্বচ্ছ তীব্রতা। যে আলোয় শোষকের চোখ ধাঁধিয়ে যায় ...!

তথ্যসূত্র:

১। দাশগুপ্ত, মৃদুল। 'ভূমিকা'। দাশগুপ্ত, মৃদুল। ধানখেত থেকে। সপ্তর্ষি প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১১, কলকাতা, পৃ- ৫।
২। দাশগুপ্ত, মৃদুল। 'ক্রন্দনরতা জননীর পাশে'। দাশগুপ্ত, মৃদুল। ধানখেত থেকে। সপ্তর্ষি প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১১, কলকাতা, পৃ- ২৪।
৩। দাশগুপ্ত, মৃদুল। 'বর্গিহানা ২০০৬'। তদেব, পৃ- ২২।
৪। দাশগুপ্ত, মৃদুল। 'রাজার ঘোড়া'। তদেব, পৃ- ১০।
৫। দাশগুপ্ত, মৃদুল। 'ইতিহাস'। তদেব, পৃ- ২৩।
৬। গোস্বামী, জয়। 'ভূমিকা'। গোস্বামী, জয়। কবিতা সংগ্রহ ৪। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৩, কলকাতা, পৃ- ৫৩৭।
৭। গোস্বামী, জয়। 'শাসকের প্রতি'। গোস্বামী, জয়। কবিতা সংগ্রহ ৪। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৩, কলকাতা, পৃ- ৪৭৯।
৮। গোস্বামী, জয়। 'শিল্প'। তদেব, পৃ- ৪৮১।
৯। গোস্বামী, জয়। 'ভরত মন্ডলের মা'। তদেব, পৃ- ৪৮৫।
১০। গোস্বামী, জয়। 'তুমি আর তোমার ক্যাডার'। তদেব, পৃ- ৪৮২।
১১। ঘোষ, শঙ্খ। 'সবিনয় নিবেদন'। ঘোষ, শঙ্খ। মাটি খোঁড়া পুরোনো করোটি। প্যাপিরাস, তৃতীয় সংস্করণ, মার্চ ২০১৬, কলকাতা, পৃ- ৩৮।
১২। ব্যানার্জী, মমতা। 'ভূমিকা'। ব্যানার্জী, মমতা। মা মাটি মানুষ। দে'জ পাবলিশিং, নবম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৮, কলকাতা, পৃ- ৫।
১৩। ব্যানার্জী, মমতা। 'নন্দী মা'। ব্যানার্জী, মমতা। মা মাটি মানুষ। দে'জ পাবলিশিং, নবম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৮, পৃ- ১৩।
১৪। ব্যানার্জী, মমতা। 'তাপসী'। তদেব, পৃ- ২৭।
১৫। ব্যানার্জী, মমতা। 'সিঙ্গুরের কান্না'। তদেব, পৃ- ৬৫।
১৬। ব্যানার্জী, মমতা। 'সিঙ্গুরের শ্মশান'। তদেব, পৃ- ১৪৩।

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা:

১। ব্যানার্জী, মমতা। নন্দী মা। দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৮, কলকাতা।
২। ঘোষ দস্তিদার, গৌতম ও বসু, ব্রাত্য। সম্পাদনা। দুঃসময় - নন্দীগ্রাম বিতর্ক। সবুজপত্র, জানুয়ারি ২০০৮, কলকাতা।
৩। সেনগুপ্ত, গার্গী ও মিত্র, চন্দনা। সম্পাদনা। সিঙ্গুর - প্রতিরোধের সূচনা। অহল্যা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, কলকাতা।
৪। দেবী, মহাশ্বেতা। তিন কন্যা ও অধবা। দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল ২০২১, কলকাতা।
৫। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা। আঁধারবেলা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পঞ্চম মুদ্রণ, আগস্ট ২০২২, কলকাতা।

৬। মজুমদার, সমরেশ। মৌষলকাল। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০২৩, কলকাতা।
৭। ঘোষ, শঙ্খ। কবিতা সংগ্রহ ৪। দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪২৯, কলকাতা।
৮। কুমার, কাঞ্চন। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের মিছিলে। ঈক্ষণ, ১ম প্রকাশ, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৭, কলকাতা।
৯। মণ্ডল, কার্তিককুমার। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন ও বাংলা ছোটগল্প। দৈনিক স্টেটসম্যান (অনলাইন সংস্করণ), ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৪, কলকাতা।
১০। মণ্ডল, কার্তিককুমার। বাংলা সাহিত্যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলন। পেজফোর (অনলাইন পত্রিকা), রবিবার, ২১ নভেম্বর, ২০২১, কলকাতা।
১১। মিত্র, সুকুমার। নন্দীগ্রাম ও জঙ্গলমহল : গণ প্রতিরোধের দিনলিপি। নেক্সাস পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, ১৪ মার্চ ২০১২, কলকাতা।
১২। চট্টোপাধ্যায়, বিতনু। নন্দীগ্রাম – আসলে যা ঘটেছিল। পত্রভারতী, জানুয়ারি ২০১৬, কলকাতা।
১৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ। বিক্ষুব্ধ বাঙলা : পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী রাজনীতি (১৯৪৭-২০০৭)। র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৪, কলকাতা।
১৪। পাল, মধুময়। সংকলন ও সম্পাদনা। আবাদভূমির আগুনবীজ (সিঙ্গুর আন্দোলনের দলিল)। দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, কলকাতা।
১৫। সেনগুপ্ত, অভিজিৎ। সংকলন ও সম্পাদনা। উচ্ছেদের গল্প। পিপলস্ বুক সোসাইটি, ১ম প্রকাশ, মার্চ ২০০৮, কলকাতা।
১৬। ভট্টাচার্য, চণ্ডীদাস। সিঙ্গুর আর নন্দীগ্রাম – প্রতিবাদ প্রতিরোধের একটি বিকল্প নাম। পরবাস পত্রিকা (অনলাইন সংস্করণ), সংখ্যা ৪০, ফেব্রুয়ারি ২০০৮।
১৭। আইচ, রূপা। সম্পাদিত। সিঙ্গুর আন্দোলন : আমাদের ভাবনা আমাদের প্রতিবাদ। ইম্যানসিপেশন, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা ২০০৭, কলকাতা।
১৮। মণ্ডল, কার্তিককুমার। সম্পাদিত। সময়ের গল্প : সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম। সংবেদন। প্রথম প্রকাশ, ২৩ জুলাই ২০১৭, মালদা।